২০২৫ - এক অন্য সন্ত্রাস

চিত্রালী ভট্টাচার্য

পাহাড়টাকে আগেও দেখেছে সুকান্ত। বহুবার। স্বপ্নে। মাঝে মাঝে ভাবনার মধ্যেও এসে দাঁড়াত। রুক্ষ, পাথর-সর্বস্ব বেপরোয়া, পাহাড়টা সুকান্তকে যেন কিছু বলতে চাইত। কোনো বেদনার কথা কি? জানে না। আজও ঘুমের মধ্যে এসে দাঁড়াল; তবে এখন আর সে আগের রুক্ষতায় নেই। শ্যামল গুল্মের জন্ম হয়েছে তার শরীরজুড়ে। ডানদিক ঘেঁষে নেমেছে একটা ছোট্ট ঝোরা। আশেপাশে গজিয়ে ওঠা অজস্র বুনোলতার গায়ে এসে বসছে নানাধরনের পতঙ্গ। প্রজাপতি, লালফড়িং, গঙ্গাফড়িং, বাদলা পোকা। বর্ষার জল পেয়ে পাহাড়ের তখন নববসন্ত। এরই মধ্যে হঠাৎ দেখা গেল পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে একটি মেয়ে। পরনে ঘাসরঙের মেখলা। তবে কি এই পাহাড়টা ওই কন্যেকে ঠাঁই দিয়েছে তার কোলে! সুকান্ত দেখতে পেল স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে পথ খুঁজে খুঁজে মেয়েটা তার দিকেই এগিয়ে আসছে। ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে ওর মুখ, ঠোঁট, কালো চোখের তারা। এরই নাম কি মানসী! ঠিক একহাত দূরে দাঁড়িয়ে কন্যে তখন চেয়ে আছে সুকান্তর দিকে। বলছে– 'তুমি জানো, পৃথিবীর সব উপাখ্যানই এক নারী আর পুরুষের যৌথ জীবনগাথা? অথবা একটা পাহাড় আর ঝোরার বা একটা নদী আর সমুদ্রের?'–জানি, জানি– চেঁচিয়ে বলল সুকান্ত, আর অমনি ঘুমটা ভেঙে গেল। স্বপ্নও উধাও। তবু সুকান্ত সেই স্বপ্নের রেশের মধ্যেই রইল বেশিক্ষণ তারপর জানলা দিয়ে তাকাল বাইরে। বাস্তবের দিকে।

বাস্তবে এখন সম্পূর্ণ বিপরীত এক প্রেক্ষাপট। গতির শহরে তখন সবে রাত নেমেছে। বাইপাসের ধারে ধারে জ্বলে উঠেছে অত্যাধুনিক স্ট্রিটলাইট। রাস্তা জুড়ে গাড়ি বন্যা। কাজফেরত বেশিরভাগই চলেছে তাদের নিজস্ব আস্তানায়। শ্রান্ত শহর তবু অদ্ভুত ক্রিয়াশীল। এ শহর ইদানিং এক ভীষণ গতিতে বেঁধে ফেলেছে নিজেকে। নতুন প্রজন্ম, নতুন ট্রেন্ড, নতুন স্টাইল অফ লিভিং, নতুন থট্। সুকান্তর মতো দু-চারজন ছাড়া কেউই আর অলস ভাবনায় সময় কাটায় না এখানে। এককালে 'কর্মবিমুখ বাঙালি' বলে যে ব্যঙ্গাত্মক উক্তি প্রায় অভিধানিক তাৎপর্য পেতে বসেছিল, তা আজ ধুয়ে মুছে এক্কেবারে সাফ। এখন প্রত্যেকটা দিনই চাপের। জিনস্-টিশার্ট, বাইক-গাড়ি, শপিং মল, মাল্টিন্যাশানালের নীল -কালো কাচের ভেতর বিপুল কর্মযজ্ঞ, বিশাল বিশাল হোর্ডিং জুড়ে লাস্যময়ী সুখ– এসব নিয়ে (একমাত্র উইক-এন্ড ছাড়া) শহরের আর নিশ্বাস ফেলার সময় নেই।

এ অসম্ভব চাপ সকলেরই যে সহ্য হয় না তা নয়, যারা পারে না তারা আত্মহননের মধ্যে দিয়ে নিজস্ব মুক্তি খুঁজে নেয়। শহর তাদের নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। শহর এখন নতুন দর্শনে বিশ্বাসী– সার্ভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট।

তবে ইদানিং এই শহরকে যা ভীষণভাবে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে, তা হল অপহরণ। গড়ে প্রায় প্রতিমাসে দু-তিন জন করে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কারা তাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে তার কোনো হদিশই পাওয়া যাচ্ছে না।

এই সন্ত্রাসের মধ্যেই আজও রাত নেমেছে শহরে। কাজ সেরে শহরবাসী সন্তর্পণে তাদের নিজস্ব ঠিকানায় ফিরছে। ঠিক তখনই সকলকে হতচকিত করে টিভির বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলের ব্রেকিং নিউজে ঝম্‌ঝম্ করে উঠল একটি মারাত্মক সংবাদ। চ্যানেলে চ্যানেলে আয়তাকার পার্পেল বক্সের মধ্যে বার বার ঝলসে উঠল একটা লাইন– 'শেষপর্যন্ত সেই সন্ত্রাসবাদী পুলিশের জালে।' এই টুকরো সংবাদটা সংক্ষিপ্ত হলেও এতটাই সেনসিটিভ ছিল যে সুকান্তর সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরই চমকে উঠল। খবরটা টেলিকাস্ট হওয়া মাত্রই শহরজুড়ে ঘন ঘন বিচিত্র রিংটোনে বেজে উঠল কয়েক লক্ষ মোবাইল।

–হ্যালো নেত্রা, শুনেছ শেষপর্যন্ত ধরা পড়েছে সে! –প্রথমজন উত্তেজিতভাবে জানাল দ্বিতীয়জনকে।

–হুম্, সেরকমই তো দেখলাম– যাক প্রশাসনের ওপর পুরনো আস্থাটা আবার ফিরে এল– দ্বিতীয়জনের স্বরে স্বস্তি।

রোহিতেরও ফোন এল সুকান্তর কাছে– চলে আয়, সন্ত্রাসবাদীকে লাইভ দেখাবে শুনেছি।

এইসব কথোপকথনের মধ্যে ধীরে ধীরে রাত যুবতী হল। এক্স-ওয়াই-জেড ইত্যাদি ইত্যাদি সেক্টরের মাল্টিস্টোরিডগুলো সেজে উঠল এক অদ্ভুত নীলাভ আলোয়। সাবালক শহর এখন এই আলোতেই অভ্যস্ত। সেই গাঢ় নীলাভ আলোয় শহরটাকে আংশিক ডুবন্ত টাইটানিকের মতো লাগছিল। এই ডুবন্ত রাতে শহরের বাসিন্দারা অনেকদিন পর যেন গসিপের মেজাজ ফিরে পেল। গপিসের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সেই সন্ত্রাসবাদী, যিনি কিছুক্ষণ আগেই ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর তৈরি ট্রেন্ড টাস্ক-ফোর্সের হাতে ধরা পড়েছেন। শোনা যাচ্ছে অপহরণের পেছনে নাকি ইনিই আছেন। অবশ্য তিনি ধরা দিয়েছেন না ধরা পড়েছেন– এ নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হচ্ছিল। চানেলে চ্যানেলে সরকার এবং বিরোধীপক্ষ, পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে অটল ছিল। যুক্তি এবং বিরুদ্ধযুক্তিতে তোলপাড় হচ্ছিল চ্যানেল আয়োজিত আসরগুলো। কিন্তু লাখটাকার প্রশ্ন হল কিভাবে ধরা হল তাকে! কারণ ওঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল মাপা, প্রতিটি অপহরণ ছিল রীতিমতো রোমহর্ষক, প্রতিটি আত্মগোপন ছিল সুনিয়ন্ত্রিত। ক্ষুরধার বুদ্ধি আর চতুর পরিকল্পনা তাঁকে প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে রেখেছিল এতদিন, তবু শেষপর্যন্ত...!

হয়তো এটাই স্বাভাবিক। সমস্ত হিসাব যেমন একদিন শূন্যে এসে মেলে, প্রতিটি জীবন যেমন একদিন মৃত্যুতে শেষ হয়, তেমনই প্রতিটি সন্ত্রাসই হয়তো একদিন ধরাপড়ায় এসে থামে।

এই মুহূর্তে সেই সন্ত্রাসবাদীকে নিয়ে আসা হয়েছে শহরের সবথেকে পুরনো স্কুলবাড়ির মাঠে। সেখান থেকে তাঁকে নাকি নিয়ে যাওয়া হবে কোনো গোপন বন্দীশালায়। ইতিমধ্যেই পাশের বাড়ির রোহিত এসে সবিস্তারে এসব জানিয়ে গেছে সুকান্তকে এবং আরও একবার ইনভাইট করে গেছে একসঙ্গে বসে লাইভ টেলিকাস্ট দেখার জন্য।

স্কুলবাড়ির মাঠ বলতে যা বোঝায় তার কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই। শহরের দুর্দন্ড প্রতাপ প্রমোটারের খপ্পরে পড়ে ইতিমধ্যেই তা প্রায়

নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু স্কোয়ার টাইপের একটা ভুখণ্ডকে ঘিরে কোনোমতে এলিয়ে পড়ে আছে স্কুলটা। নতুন প্রজন্মেরা ওটার নাম দিয়েছে নো-ম্যানস্-ল্যান্ড। সেই অবহেলিত নো-ম্যানস্-ল্যান্ডের স্কুলবাড়িতেই নিয়ে আসা হচ্ছে তাঁকে। জবরদস্ত নিরাপত্তা বলয়ে ঘিরে।

যথাসময়ে ক্রেনসমেত ক্যামেরা নেমে এল নীচে। টিভির স্ক্রীনে দেখা গেল সন্ত্রাসবাদীকে। উৎসুক শহরবাসীর প্রায় প্রত্যেকেরই চোখ তখন তাদের নিজস্ব টেলিভিশন স্ক্রীনের ওপর। সুকান্ত রোহিতদের ড্রয়িংরুমে বসে দেখল– সেই সন্ত্রাসবাদী স্থাণুর মতো বসে আছেন চেয়ারে। দুপাশে কড়া প্রহরা। চোখ নীচের দিকে। পরনে নীল জিনসের প্যান্ট, খাকি শার্ট, পায়ে সাধরণ ক্যাম্বিসের জুতো।

তাঁকে দেখে রোহিতের দশ বছরের ছেলে জলু বলে উঠল– লুক, টেরোরিস্টের কোনো ড্রেস সেন্স নেই। এতবড় একজন নেগেটিভ হিরো, সকলকে একেবারে সাট-ডাইন করে রেখেছে কিন্তু কেমন বেগারদের মতো সাজগোজ করেছে দেখো!

স্...স...স্। ডোন্ট ডিসটার্ব, জাস্ট সি– রোহিত ধমকে উঠল। জুল ভয় পেয়ে চুপ করে গেল।

গোয়েন্দাপ্রধান মি. সেন প্রথম প্রশ্নটা রাখলেন– কি নাম?

সন্ত্রাসবাদী চুপ। কয়েক সেকেন্ড একটা ভীষণ নিস্তব্ধতা নেমে এল। মি. সেন আবার তাঁর প্রশ্নটা রাখলেন–নাম?

এতক্ষণে মুখ তুলল সন্ত্রাসবাদী। চোখের চাউনি বেশ উদ্ধত। কোথাও সংকোচের লেশমাত্র নেই। বেশ নির্ভয়ে উত্তর দিল– প্রগতি। প্রগতি সেন ওরফে বহিনজী।

ঘরে ঘরে উৎসুক মুখগুলোর সামনে যেন বজ্রপাত হল– আরে ইনি তো একজন মহিলা!

ওফস্স্... রোহিতের মুখ দিয়ে এই বিচিত্র শব্দটা বেরিয়ে এল।

জুল বলে উঠল– ইন্টারেস্টিং! মম তোমাদের দলের লোক।

সুকান্তর শরীরে শুধু একটা বিদ্যুতের স্পর্শ অনুভূতি হল। ম্যাডাম! আর অমনি তার মন খুব দ্রুতগতিতে একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে ধাবিত হয়ে পৌঁছে যাচ্ছিল এক অতিনিকট অতীতে। তাড়াতাড়ি সামলে নিল নিজেকে। চোখ বুজে থাকল কয়েক সেকেন্ড।

চোখ খুলতেই দেখতে পেল বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে কয়েকশো ক্যামেরা ঝলসে উঠল ওঁকে ঘিরে। ওঁর চোখের পাতাটুকু পর্যন্ত কাঁপল না। স্থির উদ্ধত দৃষ্টি। যে দৃষ্টিতে শুধুই অটল এক দৃঢ়তা।

স্কুলবাড়িতে জমায়েত হওয়া গোয়েন্দাকর্মী এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তাদের মুখে তখন বিজয়ের হাসি। এই সন্ত্রাসবাদী এতদিন ধরে শহরটাকে একেবারে নাজেহাল করে ছেড়েছিলেন, তাঁদের ওপর আর আস্থা রাখতে পারছিল না শহরবাসী। এতদিন পর বুদ্ধি এবং দক্ষতার জোরে তাকে ধরে ফেলতে পেরেছেন এঁরা। গত তিন বছরে অসংখ্য মানুষ অপহৃত হয়েছে এই সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা। প্রতিমাসেই কেউ না কেউ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল শহর থেকে। কেউ অফিস থেকে ফেরার পথে, কেউ অফিস ট্যুরে গিয়ে আবার কেউ কেউ বাড়ির লোকেদের সাথে উইক-এন্ড মস্তিতে গিয়ে। কিন্তু কেন! কারা নিয়ে যাচ্ছে এদের! তাদের কি উদ্দেশ্য? প্রাথমিক পর্যায়ে তার কিছুই জানা যাচ্ছিল না। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর প্রশাসন জানতে পারে শহরলাগোয়া যে জেলা জঙ্গলপ্রধান সেখানেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অপহৃতদের। কিন্তু কোনো মুক্তিপণ চাওয়া হচ্ছে না। আশ্চর্য! এমনকি অন্য কোন ডিম্যান্ডও জানানো হচ্ছে না, শুধু কিছুদিন তাদের দখলে রেখে অপহৃতদের আবার ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে শহরে। তবে ফিরে আসার পর সেই নাগরিকেরা আর আগের মতো থাকছেন না। চরিত্রে, কর্মদক্ষতায় তাঁরা যেন কেমন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছেন। কেন যেন উদাসীন, ভাবনাপ্রবণ, ক্রিয়েটিভ। কিন্তু মুশকিল হল এই সব বদলে যাওয়া মানুষদের কাছ থেকে অপহরণকারীদের সম্বন্ধে কোনো তথ্যই পাচ্ছিলেন না গোয়েন্দাবিভাগের কর্তারা কারণ অপহরণের সময় ওদের সকলকেই চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হত জঙ্গলে এবং অদ্ভুতভাবে তার পরের ঘটনা তারা কেউই আর মনে করতে পারতেন না।

গোয়েন্দাবিভাগ প্রথমদিকে এদের দুষ্কৃতি ভেবেছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে জঙ্গল অঞ্চলের এখানে ওখানে কিছু পোস্টার দেখে চমকে উঠেছিল। পোস্টারে স্পষ্ট ভাষায় লেখা– 'যারা মানুষকে যন্ত্র ভাবে আমরা তাদের ক্ষমা করি না। নিশ্চিহ্ন করে দেব এইসব যন্ত্র-মানবদের এবং তাদের কারিগরদের।'

তাহলে এরা কোন সাধারণ দুষ্কৃতি নয়! সন্ত্রাসবাদী! বদলে ফেলতে চায় সমাজ ও শহর! কিন্তু কি নাম এই নিষিদ্ধ সংগঠনের, আর এদের নেতৃত্বেই বা কে আছে– এই অনুসন্ধানেরই আজ প্রথম কিস্তি উন্মোচিত হল। নেতা নয়, এই সংগঠনের প্রধান একজন নেত্রী, নাম প্রগতি সেন ওরফে বহিনজী

ক্যামেরা শুদ্ধু ক্রেন আবার নেমে এল ওঁর মুখের সামনে। বহিনজী চোখের ওপর হাত তুলে অস্বস্তি প্রকাশ করলেন। কিন্তু মিডিয়া অপারগ। এত বড় একটা ইভেন্ট নিয়ে তারা ফুল-ডে কভারের জন্য নিয়োজিত। এ সুযোগ তারা হাতছাড়া করতে পারবে না কিছুতেই।

রোহিত, জুল আর শীলা সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়েছিল টিভির স্ক্রীনে। সুকান্ত ওদের কিছু না বলে চুপচাপ উঠে এসে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে তাকাল রাতের শহরের দিকে। মনে করতে চেষ্টা করল সেদিনটার কথা যেদিন সেও অপহৃত হয়েছিল। যত দূর মনে পড়ল দিনটা ছিল সোমবার। গরমের সময়। ট্রেন এসে যখন থামল ঘাটশিলা স্টেশনে তখন বিকেল ডুবেছে। বড় বড় শালগাছের মাথার ওপর আকাশটা লালে-ধূসরে একেবারে রোমান্টিক। মাঝে মাঝে সূর্যের দু-একটা সোনালী টান। গাছের পাতায়- পাতায় আলো - আঁধারির শেষ লুকোচুরি। সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়েছিল সুকান্ত। এখনও এখানে এতখানি প্রকৃতি - প্রাধান্য! বহুদিন পর ও এসেছে। ভেবেছিল অনন্য সে প্রকৃতি কেটে - ছেঁটে নিশ্চয়ই মাল্টিস্টোরিড, শপিং মল, বিগবাজার– এটা-সেটায় শহুরে চেনা চেনা, একঘেয়ে গন্ধ এখানে ওকে একই রকম নৈরাশ্যমাখা গতিতে বেঁধে

রাখবে; কিন্তু এখানে তো একেবারে আনএক্সপেক্টেড্ প্রকৃতি! সুকান্তর সেদিন মনে পড়ে যাচ্ছিল তার প্রথম বন্ধুদের সঙ্গে বেড়ানোর দিনগুলির কথা। এই তো, এখানেই তো এসেছিল সকলে। ছোট্ট স্টেশন পেরিয়ে একটা হোটেলের দুটো ঘরে গাদাগাদি করে থেকেছিল ছয়-সাতজন। তারপর টানা তিন-চারদিন ধরে চলেছিল হুল্লোড়। কিন্তু সেসব যেন গতজন্মের কথা। এখন আর সেদিন নেই। সবকিছু বদলে গেছে। সুকান্তও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে শহুরে গতিময় জীবন। কাজের বদলে কিনেছে অজস্র সুখ। সেই কাজেরই কারণে আজ সে এসেছে ঘাটশিলায়। যে কোম্পানির সঙ্গে আজ তার মিটিং তাদেরই গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার কথা। তাই ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে সুকান্ত এগিয়ে গেল সামনের দিকে। বাঁ পাশে ছোট্ট একটা সিগারেটের দোকান, তারপরই দুটো বড় শালগাছ, তার তলায় দাঁড়িয়ে একটা টাটা সুমো। সুকান্ত নম্বর মিলিয়ে নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ একটা বাইক এসে গতিরোধ করে দাঁড়াল সামনে, আর সুকান্ত কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাইকের পেছনে বসা লোকটা নেমে ওর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বাইকে বসিয়ে, নিজেও লাফিয়ে বসতেই, সামনের জন তীব্রগতিতে ছুটিয়ে দিল বাইক। চালকের আসনে যে বসে তার মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা। স্বাভাবিকভাবেই যে পেছনে বসে আছে তারও নিশ্চয়ই একই ছদ্মবেশ। সুকান্ত কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাইক স্টেশন রোড ছাড়িয়ে পাথুরে রাস্তায়। তবু সুকান্ত শেষবারের মতো চিৎকার করে উঠতেই পিঠে এসে ঠেকল ঠান্ডা বন্দুকের নল, হিসহিস করে পেছন থেকে কেউ বলে উঠল– চিৎকার করলেই শেষ করে দেব।

–কিন্তু আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং কেন? সুকান্ত হতচকিত হয়ে জিগ্যেস করল।

–কিচ্ছু উত্তর দেওয়া যাবে না, আমরা শুধু নির্দেশ পালন করছি। পেছনের জন উত্তর দিল।

–কার নির্দেশ?

–বহিনজীর।

বহিনজী কে, কি তার উদ্দেশ্য তা না জানলেও সুকান্তর এটা বুঝতে অসুবিধা হল না সে এদের দ্বারা অপহৃত হয়েছে। তবু শেষবারের মতো মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করল– আমাকে কেন নিয়ে যাচ্ছ তোমরা? আমি তো তোমাদের কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করিনি!

–সেসব আমরা জানি না। আপাতত আপনি চুপচাপ আমাদের কথা শুনে চলুন।

বলতে বলতেই একটা বাম্প পেরোতে গিয়ে লাফিয়ে উঠল বাইকটি। সুকান্ত কোনোমতে সামলে নিল নিজেকে, অসহায়ভাবে তাকাল সামনের দিকে। যতদূর দেখা যায় লাল কাঁকর বিছানো পথ। দুধারে বড় বড় গাছ। বাইকের হেডলাইট শুধু রাস্তা কেটে ছুটেছে। আগেপাশে কেউ নেই। বাইক যত এগোচ্ছিল তত ঘন হচ্ছিল গাছ, শেষে শুরু হল জঙ্গল। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর চালক গতি কমিয়ে এনে দাঁড়াল। বলল– নামুন। এরপর হাঁটতে হবে।

সুকান্ত প্রমাদ গুণল। এতক্ষণ বাইকের লম্ফঝম্পের পর কোমরের যা অবস্থা, হাঁটতে পারবে তো!

বাইকের পেছনে যে বসেছিল, ততক্ষণে সে নেমে ঝটপট কালোকাপড় দিয়ে বেঁধে দিল সুকান্তর চোখ। ঠেলা মেরে বলল– চলুন।

–কোথায়? সুকান্ত প্রশ্নটা হুট করে করে ফেলল।

লোকটা বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে বলল–বকবক করবেন না, নয়তো...বলে গলার কাছে একটা ধাতব কিছু ধরে মুখ দিয়ে আবার এমন একটা শব্দ করল যার অর্থ সুকান্ত বেশ জানে– খালাস। তাই আর কোনো প্রশ্ন না করে ওদের পেছন পেছন চলতে শুরু করল। পায়ের শব্দ শুনে মনে হল আরও দু-একজন এসে জুটেছে। সুকান্ত সম্ভবত ওদের মাঝখানে। চলতে চলতে বার বার পা জড়িয়ে যাচ্ছিল বুনো লতায়। জঙ্গুলে গুল্মের ধারালো কাঁটায় ছড়ে যাচ্ছিল হাতের আঙুল তবু চলা থামানো যাচ্ছিল না। ভয়ে। এইভাবে আধঘন্টার পথ অতিক্রম করার পর ওরা থামল। সুকান্তও। ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা সেরে খুলে দিল সুকান্তর চোখের বাঁধন।

ওঃ, বাঁচলাম, মনে মনে বলল সুকান্ত। তারপর চারদিকটা দেখার চেষ্টা করল। যতটা দৃশ্যমান হল, তার চেয়ে অদৃশ্য রইল বেশি। ঘন অন্ধকারে সুকান্ত বুঝতে পারল সে একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে। এক হাত দূরের কোনো কিছুকে চেনার উপায় নেই, শুধু অরণ্যের একটা তীব্র স্যাঁতস্যাঁতে ভাব আর একটানা ঝিঁঝির ডাক অন্ধকার চিরে ছড়িয়ে যাচ্ছে চারিদিকে।

এখানেই আজ থাকতে হবে নাকি! প্রশ্নটা করার আগেই ওরা বলল– আপনি একনম্বরে থাকবেন। যান কিছু খেয়ে, বিশ্রাম করুন, কাল বা পরশু থেকে ট্রেনিং শুরু হবে, বলে ওরা একজনের হাতে সুকান্তকে তুলে দিয়ে চলে গেল।

পড়ে থাকা লোকটা সুকান্তকে নিয়ে এসে থামল একটা প্রান্তরে। ওর টর্চের আলোয় দেখা গেল সেখানে সার সার অস্থায়ী তাঁবু। ওরই নির্দেশে সুকান্ত গিয়ে ঢুকল প্রথম তাঁবুটিতে।

ছোট্ট তাঁবু। মাঝখানে পোঁতা একটা খুঁটিতে একটা ছোট্ট লণ্ঠন টিমটিম করে জ্বলছে। মেঝেতে জড়ো করা খড়ের ওপর সতরঞ্চি পাতা। নিশ্চয়ই ওটাই শয্যা। সুকান্ত আর কিছু ভাবতে পারছিল না। ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে বসে পড়ল সতরঞ্চির ওপর। ভয়ে, ভাবনায়, উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছিল হাত-পা। সুকান্ত বসে বসে ভাবছিল– কিসের ট্রেনিং নিতে হবে ওকে? এরা কি কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, যাদের হয়ে ওকে যুদ্ধ করতে হবে! এরা তাহলে কোনো সাধারণ অপহরণকারী নয়, যারা মোটা মুক্তিপণ আদায়ের আশায় নাগরিকদের ধরে নিয়ে যায়! কিন্তু এসব কথা বেশিক্ষণ ভাবার মতো শারীরিক ক্ষমতাও অবশিষ্ট ছিল না। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসছিল। এখান থেকে পালিয়ে যাবার কথাও ভাবতে পারছিল না সে।

হঠাৎ সে সময় তাঁবু ফাঁক করে একজন ঢুকল। হাতে কাগজের মোড়কে চারটে রুটি আর তরকারি আর মাটির ছোট্ট মটকায় জল। সুকান্ত কিছু না ভেবেই লোকটার বাড়িয়ে দেওয়া হাত থেকে রুটি নিয়ে গিলতে লাগল। খাওয়া শেষ হলে এক মটকা জল খেয়ে, কোনো কথা না বলে শুয়ে পড়ল।

এই ভাবেই পর পর দুদিন কাটল। এক নম্বর তাঁবুর খড়ের বিছানা, দুবেলা সামান্য খাওয়া-দাওয়া, আর ঘুম– এই নিয়েই। শুয়ে শুয়ে শুধু ভাবত,

কি জন্য ধরে এনেছে এরা? কি ট্রেনিং নিতে হবে তাকে? সে কি পারবে কোনো সামরিক ট্রেনিং নিতে? ভাবতে ভাবতে– একসময় ভাবনাও কমে এল। সুকান্ত তখন শুধু খেত আর ঘুমোত।

তৃতীয় দিনে প্রথম খুব ভোরে ঘুম ভাঙল পাখির ডাকে। এত ভোরে এর আগে কোনোদিন ওঠেনি সুকান্ত। সবে সূর্য উঠছে। তাঁবুর পর্দা সরিয়ে দেখল দূরের টিলাটার মাথার ওপর থেকে কমলা আলো ছড়িয়ে পড়েছে ঘাসে ঘাসে। হটা! মনে হল কুল কুল করে কি একটা শব্দ হচ্ছে। ঝর্নার? হয়তো। যে দুদিন বেশ রাতে তাকে নিয়ে যায়া হত মাঠে, প্রাকৃতিক কাজ সারার জন্য, তখন এ শব্দটা শুনেছে বলে মনে পড়ল না সুকান্তর। হয়ত ক্লান্তিতে আর ভাবনায় এতটা জর্জরিত ছিল যে কিছুই শ্রবণে যায়নি। কিন্তু আজ ভোরে ওই শব্দটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। হঠাৎ সুকান্ত আবিষ্কার করল বহুদিন পর ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সেই শহুরে ক্লান্তিটা আর আক্রমণ করল না সুকান্তকে। বরং কি একটা প্রশান্তি যেন মস্তিষ্ককে শান্ত করে দিচ্ছিল। মনে হল প্রত্যেকটা দিন যদি এরকম হত! সেই ভুতুড়ে দিনের সঙ্গে আর পাল্লা দিতে হত না সুকান্তকে। এই প্রথম মনে হল– কতটুকু আর লাগে একা একটা মানুষের! কেন সে এতদিন অযথা খেটে মরত! কিসের এত প্রতিযোগিতা! কার সঙ্গে!

ঠিক সেই সময় একজন এসে জানাল– যেতে হবে।

–কোথায়?

–ট্রেনিং-এ, বহিনজী ডেকেছেন।

এরপর আর কোনো কথা চলে না। সুকান্তও কোনো কথা না বলে অনুসরণ করল তাকে। চলতে চলতে এসে পৌঁছল একটা ঝর্নার ধারে। দেখতে পেল আশেপাশে এলোমেলো ছড়ানো পাথরের ওপর বসে আছে কয়েকজন নারী এবং পুরুষ। তবে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। তাদের সকলের পরনেই প্যান্ট-শার্ট। এছাড়াও কিছু মানুষ মানুষী আছে সেখানে যারা সুকান্তর মতোই এলোমেলো, বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত। এদেরও বোধহয় সুকান্তর মতোই ধরে আনা হয়েছে। অর উপস্তিত সকলের থেকে একটু দূরত্ব রচনা করে যিনি গম্ভীরমুখে একটা পাথরের ওপর বসে আছেন তিনি নিশ্চয়ই দলপ্রধান। মুখ ফেরাতেই সুকান্ত দেখতে পেল গাঢ় নীল রঙের শার্টের মাঝখানে ফুটে আছে একটা ফর্সা নারীমুখ। ইনিই বহিনজী? অপহরণকারী দলের পান্ডা! এ সত্য মন মানতে চাইছিল না। তবু তার দিকে তাকিয়েই সুকান্ত জানতে চাইল।

–আজ থেকে তো ট্রেনিং?

–হুম্, উনি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন।

–কিন্তু কিসের ট্রেনিং? কার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ট্রেনিং নিতে হবে আমাকে? আমি তো কোনোদিন এপথে যাইনি। আমি কি পারব? গড় গড় করে সবকটা প্রশ্ন করে ফেলে সুকান্ত সন্ত্রস্ত চোখে তাকাল নেত্রীর দিকে। কিন্তু সুকান্তকে অবাক করে নেত্রী হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে জানালেন– অন্য কারও বিরুদ্ধে নয়, যুদ্ধ তো করতে হবে নিজেরই সঙ্গে।

–নিজের সঙ্গে! সুকান্ত বোকার মতো তাকাল ওঁর দিকে।

–বুঝলে না, তাই তো?

–হুঁ, একটু বুঝিয়ে বলুন।

–বলব, কিন্তু তার আগে বলো আজ এখানে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তোমার কেমন বোধ হল?

–ভালো, খুব ভালো লেগেছে।

–কেন?

–মনে হল আজ কোনো ভয় তাড়া করবে না আমাকে। তাঁবু থেকে আজ বহুদিন পর আমি দেখতে পেলাম অসাধারণ একটা সূর্যোদয়। অপূর্ব ঝর্নার শব্দ শুনলাম, পাখির ডাকও শুনলাম।

–ঠিক স্বপ্নের মতো মনে হল কি?

–স্বপ্ন! বলতে পারব না। বহুদিন তো সেভাবে স্বপ্ন দেখি না তাই...। সে কবে– দেখতাম– দূরে...

–হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো– দেখতে দূরে– একটা মায়াকুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটা পাহাড়, নীচে বয়ে যাচ্ছে একটা পাহাড়ি নদী...

–সেই পাহাড়ে জ্যোৎস্না রাতে পরিদের দেখা পাওয়া যেত। স্বপ্নের মধ্যে দেখতাম তাদের পাখনায় লুকনো আছে বেঁচে থাকার মন্ত্র।

নেত্রী এবার সুকান্তর চোখে চোখ রেখে জানতে চাইলেন– এমন স্বপ্ন কতদিন দেখো না তুমি? কারা কেড়ে নিল তোমার স্বপ্ন? কবে থেকে সেই স্বপ্নময় পথ বেঁকে গেল গতির দিকে? কারা শুধুমাত্র কঠিন বাস্তব বেঁধে দিল তোমার পিঠে? ভেবে দেখেছ কখনো? ভেবে দেখেছ এই গতির শেষে কি পরমার্থ পাওনা হবে তোমার জন্য?

–জানি না, সত্যি সত্যিই জানি না। শুধু জানি ছুটতে হবে, এগোতে হবে, অ্যাচিভ করতে হবে এনি হাউ।

–আর তোমরা স্বপ্ন! তার কি হবে? সে তো হারিয়ে গেল! কিন্তু স্বপ্ন ছাড়া কি জীবন হয়! তাই আমরা সংগঠিত হয়েছি। আমরা সেই হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন তোমাদের ফিরিয়ে দিতে চাই সুকান্ত। শুধু তুমি নও, তোমাদের মতো অসংখ্য শহরে যন্ত্রমানবদের আবার রূপকথার মতো একটা সুন্দর জীবন ফেরত নিয়ে যাওয়ার শপত নিয়েছি আমরা। ভালো কথায় কাজ না হলে আমরা জোর খাটাই। বাধ্য করি। তোমাকেও তাই অপহরণ করতে বাধ্য হয়েছি। তোমার হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন খুঁজে পেতে আমরা তোমাকে সাহায্য করব। যতদিন সে পথ খুঁজে না পাও ততদিন তোমায় থাকতে হবে এখানে।

এরপর থেকে টানা দেড়মাস। সুকান্তর জীবন যেন প্রজাপতির জীবনচক্র। প্রথম কদিন শুঁয়োপোকার শুককীট অবস্থা। সেই পর্যায়ে সুকান্ত চপচাপ বসে থাকত অরা শুধু ভাবত। ভাবত কিভাবে শুরু হলে তার স্বপ্নজীবন! ঝর্নার ধারে বসে ভাবতে ভাবতে এক একদিন কেমন যেন ঝিম ধরে যেত।

ঘুম পেত প্রবল। ধুম ভাঙলে অলস পায়ে ফিরে আসত জঙ্গলের পথ ধরে। এরপর এল পরবর্তী পর্যায়। তখন পরস্পরবিরোধী ভাবনা পেয়ে বসত। এক একবার মনে হত, এই নিঃসঙ্গ জীবন অসহ্য। যে করেই হোক পালিয়ে যাবে এখান থেকে। ফিরে যাবে শহুরে গতিময়তায়। কিন্তু পালাতে পারবে কি? সেভাবে এখানে ওকে কেউ আটকে না রাখলেও নিশ্চয়ই সতর্ক দৃষ্টি আছে অজ্ঞাত প্রহরীদের। পালাতে গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। আবার মনে হত পালিয়ে গিয়ে কি লাভ। ওখানে তো সেই একঘেয়ে গতির ঘেরাটোপ। কাজ কাজ আর কাজ । সুখ কেনার প্রতিযোগিতা। তারচে দেখা যাক না স্বপ্নের পথটা কতদূর। এরকম দ্বন্দ্বর মধ্যে একদিন সুকান্ত হাঁটতে বেরিয়ে পড়ত। হাঁটতে হাঁটতে চলে যেত বড় টিলা পর্যন্ত। তারপর পরিশ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ত টিলার পায়ের তলায়। ধীরে ধীরে ওখানে কতরকম শব্দের সাথে পরিচিত হতে থাকল! অরণ্যের ভারি গাছের শব্দ, পাখিদের ডানার শব্দ, এমনকি নৈঃশব্দের গুরুগম্ভীর শব্দও শুনতে পেত সে। শুনতে শুনতে এক একসময় কি এক ভাবনা জাগত মনে। বুকের মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠত আবেগ। অচেনা কারও আকাঙ্ক্ষায়। মন বলত– চাই– তাকে চাই। শহরে থাকতে এমন কখনো হয়নি তো! সেখানে কত অপশন। একটা গেল তো হাতের কাছে আরও আরও অসংখ্য প্রকরণ। সেখানে চাইবার আগেই পাওয়া। মেঘ না চাইতেই জলে জলে একেবারে থৈ থৈ। উপছে পড়ে ভেসে যেত মন অন্য আকাঙ্ক্ষায়। দমবন্ধ হয়ে যেত। নাগপাশের মতো জড়িয়ে ধরত গতি। আর এখানে! বিস্তৃত আকাশের তলায়, সবুজ অরণ্যের মধ্যে তার চাওয়া ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াতে চাইত কোনো অপার্থিবকে। মাঝে মাঝে সে অপার্থিব আলোর মতো স্পর্শ করত তাকে। গান জাগত মনে, ঘুম আসত, আনন্দ আসত, তীব্র হত ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা। অবশেষে সে পথ ধরে একদিন হঠাৎই, হ্যাঁ হঠাৎই স্বপ্ন এল। ঘুমের মধ্যে সুকান্ত দেখল ঘুমন্ত সবকিছু জেগে উঠছে। জেগে উঠছে এই অরণ্যও, অরণ্যের পশু- পাখি, ঝর্না-পাহাড়, পথ - ঘাট এমনকি জেগে উঠছে হাজার হাজার মানুষের হৃদয়। সে হৃদয়ের রঙ আলতো, মায়াতে মেশা। আশ্চর্য!

এই তাহলে স্বপ্ন! এ যদি স্বপ্ন হয় তবে সে এ নির্বাসন আজীবন গ্রহণ করতে রাজি। স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে সুকান্ত ছুটতে লাগল তার অস্থায়ী তাঁবুর দিকে। এক্ষুনি জানাতে হলে ম্যাডামকে। বলতে হলে– আমি পেয়ে গেছি।

ছুটতে ছুটতে দম ফুরিয়ে আসছিল তবু সে থামেনি। কি এক উত্তেজনা যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আনন্দে ভরে উঠছিল মন। শেষপর্যন্ত সে এসে আছড়ে পড়ল বহিনজীর তাঁবুর সামনে। চেঁচিয়ে বলল– আমি পেয়ে গেছি, আমি পেয়ে গেছি সে স্বপ্নপথ।

পরদিনই তাকে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল শহরে। ফিরে এসে সে একটু একটু করে তৈরি করছে তার স্বপ্নজীবন। নাহ্, গতির কাছে আর ফিরে যায়নি সে বরং গতি থেকে দূরে তার নিজস্ব বাসভূমি গড়ে তুলেছে গোপনে।

ক্রেন সমেত ক্যামেরা আবার ঝুঁকে এল বহিনজীর মুখের ওপর। গোয়েন্দাপ্রধান প্রশ্ন করলেন– কেন অপহরণ করেন আপনারা? কি চান? জানেন আপনাদের এই অত্যাচারে আমাদের শহরবাসী কতখানি নাজেহাল এবং আতঙ্কিত? তারা তাদের নির্দিষ্ট কাজ করে উঠতে পারছে না। হু হু করে নেমে যাচ্ছে তাদের সাকসেস রেট।

–কিসের সাকসেস? বহিনজী তির্যক তাকালেন।

–ইনডিভিজ্যুয়াল এবং কালেকটিভ সাকসেস? সে সাকসেসের কেন্দ্রে আছে কাজ। কাজ যত করবে তত সাকসেস বাড়বে এবং তার সঙ্গে বাড়বে অর্থ। সে অর্থ খরচ করে তারা সুখ কিনতে পারবে। এভাবেই। কিন্তু সেসব এক্সপ্ল্যানেশন থাক। আপনি বলুন আপনাদের সংগঠনের কাজটা কি? কি উদ্দেশ্যে আপনারা অপহরণ করেন?

–অপচয় শেখাতে– বহিনজী অকুতোভয়।

–অপচয় শেখাতে! সেটা কিরকম?

–আত্মকেন্দ্রিক শহরবাসী কেবলমাত্র নিজের কথা ভাবতে ভাবতে অপচয় ভুলে গেছে। তাই আমরা ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যের জন্য সময় নষ্ট করতে শেখাই। স্বপ্ন দেখতে শেখাই, জেগে উঠতে শেখাই।

–চুপ করুন– মি. সেন গর্জে উঠলেন। এলোমেলো আর অবাস্তব কথার আড়ালে আপনারা এক বিকৃত সন্ত্রাস চালান। এতদিন যে সন্ত্রাসের সাথে আমরা পরিচিত ছিলাম এর স্বরূপ তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ এক অদ্ভুত মানসিক সন্ত্রাস। আপনারা ইন ফ্যাক্ট মনদ্রোহী। আপনাদের কঠিনতম শাস্তি হওয়া দরকার। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। যাতে ভবিষ্যতে...

কথা শেষ হয় না, তার আগেই আবার টিভির বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলের পার্পেল বক্সের মধ্যে জলজল করে ওঠে ব্রেকিং নিউজ– 'আজ একটু আগে এই শহরের মাননীয় মেয়র অদ্ভুতভাবে তার বাসভবনের সামনে থেকে অপহৃত হয়েছেন। শহর জুড়ে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। জোর তল্লাসি চলছে রাজ্য জুড়ে।'